বর্তমান দুনিয়ায় মার্ক্সবাদের প্রাসঙ্গিকতা

মলয় রায়চৌধুরী

মার্ক্সবাদ শুনলেই পশ্চিমবাংলার পেটমোটা নাড়ুগোপাল টাইপের নেতাদের মুখ ভেসে ওঠে, গ্রামে তিনতলা আধুনিক বাড়ি, শহরে ছেলের জন্যে নার্সিং হোম, মেয়ের জন্যে ইশকুল করে দিয়েছেন জনগণের গ্যাঁড়ানো টাকায় ; সেই সঙ্গে সাঁইবাড়ি হত্যা, মরিচঝাঁপি গণহত্যা, আনন্দমার্গীদের জ্যান্ত পোড়ানো, নানুর গণহত্যা, নন্দীগ্রাম গণহত্যা আর আরও নানান কেলোর কীর্তি। কিংবা সেই সব গালফুলো নেউলে লেখকদের মুখ ভেসে ওঠে যারা রাতারাতি জার্সি পালটে বামপন্থী শাসকদের লেজ ধরে পুরস্কার বা কুর্সি হাতিয়ে ফালতু বইকেও বেস্টসেলার করে ফেলেছিল। অথচ মার্ক্সবাদ বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে সংসদীয় গণতন্ত্রের কবলে আটক এই লোকগুলোর রাজনৈতিক কাজকারবারের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

সেই কারণেই এই বছর মার্ক্সের জন্মদ্বিশতবার্ষিকীতে যতটা বিশ্বকর্মা বা শেতলা পুজো নিয়ে হইচই হল, মার্ক্সকে নিয়ে বিশেষ তক্কাতক্কি দেখা গেল না। পশ্চিমবাংলার বাঙালির মন থেকে মার্ক্সকে মুছে ফেলতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে সেই লোকগুলো যারা নিজেদের মার্ক্সবাদী বলে চালাবার চেষ্টা করেছে, যেমন বামপন্থী দলগুলো, যেমন নকশালপন্থী নেতারা, যেমন জঙ্গলে বিপ্লব করার জন্য লুকিয়ে থাকা মাওবাদীরা। জানি না চারু মজুমদার কেমন করে অনুমান করেছিলেন যে পশ্চিমবাংলায় বিপ্লব হলে তা বহুত্ববাদী গোঁড়া-ধর্ম, কট্টর মৌলবাদ, জাতিপ্রথা ও বিচিত্র-বিশ্বাস এবং সংস্কৃতিতে জড়িয়ে থাকা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে; মাওয়ের চিনের 'স্প্রিং থান্ডার' শুনে অনেকের মতো উনিও রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন, যদিও তার আগেই চিন ভারতের আকসাই চিন আর তিব্বত দখল করে নিয়েছিল। মাঝখান থেকে উনি পশ্চিমবাংলার কিশোর-তরুণদের 'ক্রিমি লেয়ার'-কে লোপাট করতে এমন সাহায্য করলেন যে বাঙালি মধ্যবিত্তের একটা পুরো প্রজন্ম নষ্ট হয়ে গেল। আর পশ্চিমবাংলার পিছিয়ে পড়ার সেটাই প্রধান কারণ। মার্ক্সের চালু করা বামপন্থীদের প্রিয় অভিধা অর্থাৎ, প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়ার মাঝে একটা বিরাট মধ্যবিত্ত বাফার শ্রেণি সব দেশেই গড়ে উঠেছে, যাদের আবির্ভাবের কথা মার্ক্স অনুমান করতে পারেননি, আর তারা বেশিরভাগই, যাকে বলে সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি, তা থেকে মোটা টাকা রোজগার করে, নিজেদের শ্রমিক বলে মনে করে না। এদের, যাদের বলা হয় মিলেনিয়াল জেনারেশন, তারা মার্ক্স পড়েনি, পড়ার আগ্রহও নেই।

মার্ক্সবাদীরাই মার্ক্সবাদের সবচেয়ে বড় অপপ্রচারকারী হয়ে দেখা দিয়েছে; তারা সেই ১৮-১৯ শতকেই আটকে আছে; তার কারণ তারা মার্ক্সের নয়, লেনিনের এবং মাওয়ের ভক্ত। আর স্তালিন যা পেয়েছিলেন লেনিনের কাছ থেকে সেই অর্থনৈতিক মতাদর্শ কমিউনিস্ট দেশগুলোয় কমিনটার্নের মাধ্যমে চাউর করতে চেয়েছিলেন। ট্রটস্কিদের সব কমিউনিস্ট দেশেই খুন করা হয়েছে। মার্ক্স তো খুনোখুনির কথা বলে যাননি যা কাচিনের জঙ্গলে স্তালিন করেছিলেন, মাও করেছিলেন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে, পলপট করেছিলেন দেশের

খোলনলচে পালটে ফেলার জন্যে। মার্ক্স বলেছিলেন 'ডিকটেটরশিপ অফ দি প্রলেতারিয়েত'-এর কথা, কিন্তু তথাকথিত কমিউনিস্ট দেশগুলোয় দেখা দিল এক-একজন মানুষ একনায়ক, যেন প্রলেতারিয়েত বলতে তাকেই বোঝায়, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তারা ডিকটেটরি করে গেছে; কুর্সিতে বসে থাকার জন্য নাগরিকদের পেছনে এমন গোয়েন্দা লাগিয়েছিল যে কেউ ভয়ে ট্যাঁ-ফোঁ করত না।

নিজেদের মার্ক্সবাদী বলে দাবি করা একনায়কেরা বিভিন্ন সময়ে উৎপীড়কের ভূমিকা নিয়ে মার্ক্সের সুখ্যাতিকে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে; যদিও মার্ক্স নিজে কখনো এসব খুনোখুনি, গুলাগ আর্কিপেলাগোর নিষ্ঠুর বর্বরতা, লাশ লোপাট, লেখালিখির বিরোধিতা, কবিদের গুমখুন ইত্যাদির কথা বলেছেন বলে কোথাও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সোভিয়েত আর পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো এবং মাও-শাসিত চীনে সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়ার মূল কারণ হল সেখানকার সরকার জনগণকে আশানুরূপ জীবনব্যবস্থা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে টেক্কা দিতে পারার মতো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা লেনিনবাদ-স্তালিনবাদ-মাওবাদ গড়তে পারেনি। ভেনেজুয়েলার মতন একটা ধনী দেশকেও ডুবিয়ে ফেললে আধা-লেনিনবাদী উগো শাভেজ যেটি ছিল বিশ্বের অন্যতম প্রধান তেল উৎপাদনকারী দেশ। চাভেজের শাসনাধীনে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশটির তেলের মূল্য অনেক বেড়ে যায়। একে পুঁজি করে তিনি দেশে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও সামাজিক আবাসন খাতে বিশেষ সাফল্য দেখাতে সক্ষম হন। তেলের অর্থে দরিদ্র জনগণের জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসুবিধা নিশ্চিত করে সাধারণ ভেনেজুয়েলাবাসীদের কাছে জনপ্রিয় নেতা হয়েছিলেন চাভেজ। তবে গরিবদের জন্য কাজ করলেও গরিব-ধনীর বৈষম্য কমিয়ে আনতে পারেননি। আবার তাঁর সময়েই অপরাধ, দুর্নীতি ও মূল্যস্ফীতি এমন বেড়েছিল যে তাঁর শিষ্য নিকোলাস মাদুরো দেশটাকে সামলাতে পারছেন না। আশ্চর্য যে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি ভেনেজুয়েলা সম্পর্কে তেমন উৎসাহ দেখায় না।

মার্ক্সবাদ শুনলেই কমিউনিস্ট দেশ, কমিউনিস্ট সরকার, কমিউনিস্ট পার্টির কথা এসে যায়। কিন্তু স্তালিন, মাও, পলপট, পূর্ব ইউরপের চোসেস্কুদের মতন একনায়কদের কথা তো বলেননি মার্ক্স, যারা জনগণকে পেঁদিয়ে, সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে, জেলে ঢুকিয়ে, মাটির তলায় পুঁতে, এলাকা-ছাড়া করে, জলচল বন্ধ করে, সমাজ আর রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে, সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দেবে; মার্ক্স যা বলে গেছেন তার বদলে নিজেদের মতামতকে কমিউনিজমের নামে চালাবে! ওই একনায়কদের নকল করতে গিয়ে, তাঁবেদার স্কুল-শিক্ষক নিয়োগ করে আর পাড়ার ক্লাবের মহল্লা কমিটির মাধ্যমে স্তালিনি নেটওয়র্ক বসিয়ে, প্রতিটি পরিবারে ব্যক্তিগত সমস্যায় নাক গলিয়ে পশ্চিমবাংলায় জনগণকে পেঁদানোর খেলায় মেতে ছিল বাঙালি কমিউনিস্টরা, আর সমাজকে সাজিয়ে তোলার সবচেয়ে ভালো সুযোগটা হারাল, যেমন আফগানিস্তানে ঢুকে কমিউনিস্ট সরকারকে সিংহাসনে বসাবার জন্যে সোভিয়েত দেশ আত্মহত্যার রাস্তায় এগিয়ে গিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রমাণ করেছে, বেসরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বিলুপ্ত করলেই মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব পরিবর্তন হয় না। বেশিরভাগ মানুষই স্বভাবজাত কারণে সর্বজনীন কল্যাণের দিকে নিজেকে

সঁপে দেওয়ার বদলে নিজের হাতে ক্ষমতা ও অগ্রাধিকার চায়, অন্যদের চেয়ে বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে চায়। মজার বিষয় হল, এখনো যে দেশগুলো নিজেদের মার্ক্সবাদের অনুসারী বলে দাবি করে, সে দেশগুলোর ইতিহাস বলছে, সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পদের প্রবাহ যৌথ মালিকানাভিত্তিক সম্পদ প্রবাহের চেয়ে অনেক জোরালো ছিল।

মার্ক্স বলেননি যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর ব্যবসাকে ধ্বংস করে দিয়ে তা রাষ্ট্রের আয়ত্বে আনতে হবে। তিনি কিছু-কিছু শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণের কথা বলেছিলেন যা আমাদের দেশে নেহেরু আর অন্য পুঁজিবাদী দেশের নেতারা করে দেখেছেন তার ফল কেমন হয়। মার্ক্স বলেননি যে সকলের টাকাকড়ি সোনাদানা কেড়ে নিয়ে তা সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে আর জনগণের মধ্যে পুনর্বণ্টন করতে হবে; তিনি বলেছিলেন ধাপে-ধাপে বাড়ানো আয়করের কথা, যা এখন বহু দেশে মান্য করা হয়। মার্ক্স ব্যক্তিগত পরার্থবাদীতার কথা বলেননি, যে লোকে নির্দেশ ছাড়াই কাজ করে যাবে; তিনি বলেছিলেন যে সবাই নিজের সৃজনক্ষমতা অনুযায়ী শ্রম করবে। সবাইকে খেতমজুর, মিলমজুর কিংবা কারিগর হতে হবে এমন কথা তিনি বলেননি, যা চকচকে সোভিয়েত পত্রিকাগুলো এককালে প্রচার করত আর হবু বাঙালি কমিউনিস্টরা খেত; পলপট তাকে চালু করতে গিয়ে দেশে খুলি আর কঙ্কালের মিউজিয়াম তৈরি করে ফেলেছিল। মার্ক্স বরং শ্রমিকদের তাদের সৃজনক্ষমতা অনুযায়ী মজুরি দেবার কথা বলেছিলেন।

কমিউনিজম বলতে বামপন্থীরা যা বোঝানোর চেষ্টা করেন, তা মার্ক্সবাদ নয়, তা লেনিনবাদ আর মাওবাদ। সোভিয়েত রাষ্ট্র কিংবা মাওয়ের চিন, মার্ক্স-কথিত কমিউনিস্ট দেশ ছিল না। সবচেয়ে মজার যে নব্যপুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশ চিন তার একমাত্র দলটাকে বলে কমিউনিস্ট পার্টি অফ চায়না। কমিউনিস্ট পার্টি বলতে কী বোঝায় তা লেনিন বাতলে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাই আমাদের দেশের মার্ক্সবাদীরা চোখ খুলে দেখেনি যে জাতিপ্রথা কেমন ভয়ঙ্কর চেহারায় এখানে সক্রিয়। চিনও চেষ্টা করছে জিনজিয়াং প্রদেশে হালাল-প্রথা বন্ধ করতে, নামাজ পড়া বন্ধ করতে; যারা করছে তাদের পাঠানো হচ্ছে সংশোধনাগারে -- এই সমস্ত সংশোধনের কথা মার্ক্স বলে যাননি। তিব্বতে হানদের পাঠিয়ে তিব্বতি তরুণীদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সেখানকার ডেমোগ্রাফি আর সংস্কৃতিকে বদলে ফেলতে চাইছে।

মার্ক্সের সময়ে কারখানাগুলোর মালিকানা ছিল পারিবারিক, পুরো শহর জুড়ে কারখানার মালিক কোনো বিশেষ পরিবার, সেই কারখানাগুলোয় কিশোররাও কাজ করত যাদের পড়াশুনোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এইরকম কারখানা-শহর ইউরোপেও এখন চিন্তা করা যায় না। কোনো কারখানা-শহরে স্কুল থাকলে মালিকরা তাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করে বিনা মজুরিতে কারখানায় খাটিয়ে নিত। তবুও মার্ক্স প্রাসঙ্গিক, কিন্তু লেনিনবাদ আর মাওবাদ প্রাসঙ্গিক নয়। এই জন্যে প্রাসঙ্গিক যে পৃথিবীতে গরিব আর ধনীর মধ্যে আয়ের পার্থক্য অনেক বেড়ে গেছে, এমনকী বর্তমান চিনেও। চিনে গ্রাম ঘিরে ফেলে গ্রামবাসীদের উৎখাত করে অন্য কোথাও বসবাস করতে পাঠানো হয় যাতে সেখানে কারখানা বসানো যায়। চিনে মজুরি অনেক কম দেওয়া হয় যাতে চিনের

তৈরি জিনিসপত্র পৃথিবীর বাজারে সবচেয়ে কম দামে বেচা যায়, এমনকী ভারতের সস্তা দামের জিনিসপত্রের বাজারও চিন দখল করে ফেলেছে চিনা শ্রমিকদের ঘামের বদলে। ব্যক্তিমানুষ যেমন আর্থিকভাবে ওপরে ওঠার তাল করে তেমন চিনও করছে।

সোভিয়েত ব্যবস্থার পতন, বার্লিনের দেওয়াল ভেঙে পড়া, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর রাজনৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন, পশ্চিমবাংলা আর ত্রিপুরায় বামপন্থীদের কুর্সি ছাড়ার সঙ্গে মার্ক্সবাদের প্রাসঙ্গিকতা জুড়লে বুঝতে গোলমাল হবে। বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা মার্ক্সে বিশেষ আগ্রহী নয়; যারা বিপ্লব করে সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখছে তারা লেনিনবাদী বা মাওবাদী। মার্ক্সবাদ যুক্তি দিয়েছিল যে একটা জাতির উৎপাদন সম্পর্ক জাতিটির 'অবকাঠামো' নির্ধারণ করে, যা সর্বহারা শ্রেণী এবং পুঁজিবাদীদের দ্বারা চিহ্নিত, যেখানে শ্রম শোষণের জন্য একটি প্রবণতা নিয়ে বিরোধ ছিল। এই সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য 'সুপারস্ট্রাকচার' তৈরি করা হয়েছিল এবং এটি ছিল রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠান। পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের (সর্বহারা শ্রেণীর) কাছ থেকে আরো শ্রমের চাহিদা বাড়াচ্ছিলেন, এটি কোনও নির্ণায়কে পৌছায় না; তখন বিদ্রোহ হবে এবং প্রাক্তন বাহিনী উধাও হয়ে যাবে। সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র হবে, যার মাধ্যমে জনসাধারণ দেশ শাসন করবে। যাই হোক, যেমন সিস্টেমের মধ্যে সাধারণত ঘটে, নতুন এলিট সম্প্রদায় তৈরি হল এবং সব ঝোল তারা নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করতে লাগল। সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের বদলে একজন মানুষ একনায়ক হয়ে দেখা দিল, এবং প্রতি ক্ষেত্রেই তারা সৈন্যবাহিনীর পুরুষ।

মাও সে-তুংয়ের আমলে চিনের বেশির ভাগ মানুষ গরিব ছিল। মাওয়ের পর ১৯৭৮ সালে তাঁর উত্তরসূরি দেং জিয়াওপিং (যিনি বলেছিলেন 'বিড়াল সাদা কি কালো সেটা বড় কথা নয়, সেটি ইঁদুর ধরছে কি না, সেটাই বড় কথা') ক্ষমতায় বসার পর চিনের অর্থনীতি দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। এর কারণ হল, দেং জিয়াওপিং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎপাদন অনুমোদন করেছিলেন। তাঁর এই সংস্কারের কারণেই চিনের আশি কোটি গরিব মানুষের অবস্থা ফিরেছে, যারা মাওয়ের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে না খেয়ে মরছিল। মাওয়ের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে এই নতুন রদবদলের দরুণ চিন ইউরোপের বহু দেশের চেয়ে বেশি অর্থনৈতিক সাম্য আনতে পেরেছেত। যদিও চিন এখনো বলে যাচ্ছে তারা কমুনিস্ট পার্টি অফ চায়নার নির্দেশে চলে আর তারা 'চিনের নিজস্ব আদলের সমাজতন্ত্র' গড়ে তুলছে। যদিও সেই সমাজতন্ত্রের সঙ্গে মার্ক্সের সমাজতন্ত্রের কোনও মিল নেই। ভারতদের সংসদীয় গণতন্ত্রের তুলনায় অনেক এগিয়ে গেছে চিন যা ভারতের সংসদীয় বামপন্থীদের নজরে পড়ে না। চিন এখন আফ্রিকার দেশগুলোকেও আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে যেমনটা এককালে ইউরোপের দেশগুলো দিত।

চিন যদি মার্ক্সের চিন্তাভাবনার দ্বারা এখন আর প্রভাবিত না হয়, তাহলে আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে চিনের অর্থনীতির মতো রাজনীতিতেও মার্ক্স এখন আর প্রাসঙ্গিক নন, তা সে দেশের পার্টির নাম কমিউনিস্ট পার্টি অফ চায়না হলেও। তারপরও কিন্তু মার্ক্সের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব রয়েই গেছে। ইতিহাস সম্পর্কে দেওয়া তাঁর বস্তুবাদী তত্ত্ব আমাদের মানবসমাজের চালিকাশক্তির গতি-প্রকৃতি বুঝতে কিঞ্চিদধিক সাহায্য করে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে মার্ক্সের প্রাসঙ্গিকতা একেবারে ফুরিয়ে যায়নি।